কেন জলবায়ু-রাজনীতি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ

নাওমি ক্লেইন

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব সম্মেলন এবং একটি চুক্তির বিষয়েও সমঝোতা হলো। কিন্তু কী হলো আসলে? এই সংকট নিয়ে বিশ্বজুড়ে বহুকিছু ঘটছে, অনেক টাকাপয়সা খরচ হচ্ছে, হচ্ছে মেলা আলোচনা-চুক্তি-বিধি-সমঝোতা-সিদ্ধান্ত...। শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো দূর করবার কাজটাতেই হাত দেয়া যাচ্ছে না। গবেষক-আন্দোলন সক্রিয় ব্যক্তি নাওমী ক্লেইন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে এই বিষয়টিই গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। এখানে তার একটি অধ্যায়ের সারকথা।

আমি জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করে আসছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। আমার অস্বীকার করাটা ঠিক ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং টি পার্টির মতো নয়; তারা তো শীতকালের অস্তিত্ব দেখিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে ভুয়া প্রমাণ করতে চায়! কিন্তু আমি এই বিষয়ের গভীরে ঢুকিনি, এ সম্পর্কিত ভয়ংকর খবরগুলোতে কেবল চোখ বুলিয়ে রেখে দিয়েছি। আমি নিজেকে বুঝিয়েছি, বিজ্ঞান অনেক জটিল বিষয়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার জন্য পরিবেশবাদীরা তো আছেই।

এমন করে আমরা অনেকেই জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করে চলেছি। আমরা মুহূর্তের জন্য হয়তো তাকাই, তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেই। কিংবা হয়তো তাকিয়েই এ নিয়ে একটা কৌতুক করে বসি, যা একরকম অস্বীকারই।

অথবা আমরা তাকাই কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের আশ্বস্ত করি এই বলে যে, মানবজাতি অনেক বুদ্ধিমান, ঠিকই একটা জাদুকরি প্রযুক্তির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন শুষে নেওয়ার একটা উপায় বের করে ফেলবে কিংবা জাদুমন্ত্রের মতো সূর্যের তাপ হঠাৎ কমিয়ে দেবে। আমার এখন মনে হয়, এটাও অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার মতোই।

অথবা আমরা তাকাই, তাকিয়ে অতিবাস্তববাদী হয়ে যাই ('জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া বেশি জরুরি। কারণ সম্পদই চরম আবহাওয়া থেকে সবচেয়ে ভালো প্রতিরক্ষা দেয়'), যেন নগর পানিতে তলিয়ে গেলে বাড়তি কিছু ডলার মহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। একজন নীতিনির্ধারক যখন এমন করে ভাবেন, তখন তা জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে না তাকানোর মতোই।

অথবা আমরা তাকাই কিন্তু নিজেদের বোঝাই–আমরা এমন ব্যস্ত যে এত দূরবর্তী ও বিমূর্ত একটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমাদের নেই। যদিও আমরা চোখের সামনেই দেখছি নিউ ইয়র্কের পাতালপথ পানিতে ডুবছে, পানি থেকে বাঁচতে নিউ অরলিন্সের মানুষ বাড়ির ছাদে উঠতে বাধ্য হয়েছে; যদিও আমরা জানি কেউই নিরাপদ নয়, সমাজের দুর্বলতম অংশ তো নয়ই। এটাও তো এক ধরনের অস্বীকারই।

অথবা আমরা তাকাই কিন্তু নিজেদের বোঝাই–আসলে নিজেদের পরিবর্তন ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। আমাদের উচিত ধ্যান করা, কৃষকদের নিজস্ব মার্কেটে বাজার করা আর গাড়ি চালানো বাদ দেওয়া। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সেই ব্যবস্থাটি পরির্তনের কথা, যে ব্যবস্থা জলবায়ু সংকটকে অনিবার্য করে তুলেছে। মনে হতে পারে, এভাবে বোধ হয় আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, কারণ নিজেদের জীবনযাপনের পরিবর্তন আসলেই জলবায়ু সংকটের সমাধানের একটা অংশ। কিন্তু এভাবে তাকানো আসলে এক চোখ বন্ধ করে রাখা।

অথবা আমরা হয়তো তাকাই, আসলেই তাকাই কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যাই। মনে করি, তারপর আবার ভুলে যাই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাই এমন যে একটানা দীর্ঘদিন মাথায় রাখা কঠিন। বাস্তব কারণেই বারবার আমরা এমন অদ্ভুত ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক স্মৃতিবিভ্রমে (ইকোলজিক্যাল অ্যামনেসিয়া) ভুগতে থাকি। অস্বীকার করতে থাকি, কারণ আমাদের ভয় হলো পুরো বাস্তব সামনে হাজির হলে সবকিছু পাল্টে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের এই ধারণাটা ঠিক।

আমরা জানি, যদি এভাবে বছরের পর বছর ধরে বর্তমান হারে দূষণ বাড়তে দিই, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সবকিছুই বদলে যাবে। বড় বড় নগর পানিতে ডুববে, প্রাচীন সভ্যতাগুলো সাগরের পেটে যাবে এবং খুব সম্ভব আমাদের সন্তানদেরকে তাদের জীবনের একটা বড় অংশ কাটাতে হবে মারাত্মক ঝড় আর তীব্র খরার হাত থেকে বাঁচার সংগ্রামে। এই ভবিষ্যৎকে বাস্তবায়ন করতে আমাদের কিছুই করতে হবে না। আমাদের যা করতে হবে তা হলো কিছুই না করা। প্রযুক্তিগত সমাধানের আশায় দিন গোনা বা নিজেদের বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকা কিংবা ব্যস্ততার অজুহাত দেওয়ার মতো যে কাজগুলো আমরা করছি, সেগুলো চালিয়ে গেলেই চলবে।

যদি এভাবে বছরের পর বছর ধরে বর্তমান হারে দূষণ বাড়তে দিই, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সবকিছুই বদলে যাবে। বড় বড় নগর পানিতে ডুববে, প্রাচীন সভ্যতাগুলো সাগরের পেটে যাবে এবং খুব সম্ভব আমাদের সন্তানদেরকে তাদের জীবনের একটা বড় অংশ কাটাতে হবে মারাত্মক ঝড় আর তীব্র খরার হাত থেকে বাঁচার সংগ্রামে।

এই ভয়ংকর ভবিষ্যৎকে প্রতিরোধ করা কিংবা তার ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার বহু পথ রয়েছে। কিন্তু এর জন্যও সবকিছু পরিবর্তনের প্রশ্নটি চলে আসে। আমাদের মতো উঁচুমাত্রায় ভোগী ক্রেতাদের জন্য এর অর্থ হলো আমাদের জীবনযাপনের ধরন পাল্টানো, অর্থনীতি পাল্টানো, এমনকি পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কি গল্প করি সেটাও পাল্টানো। আশার কথা এই পরিবর্তনগুলো তেমন ভয়ংকর কোনো কিছু নয়। অনেকগুলো তো ভীষণ আকর্ষণীয়। কিন্তু আমি নিজেও এসব বুঝেছি খুব বেশিদিন হয়নি।

আমার খুব ভালো করেই মনে আছে ঠিক কোন সময়টায় আমি জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া বাদ দিলাম। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বলিভিয়ার তরুণ রাষ্ট্রদূত অ্যাঞ্জেলিকা নাভারো লানোসের সাথে আমার একটা বৈঠক ছিল। বলিভিয়া ছোট্ট ও দরিদ্র একটি দেশ হওয়ার কারণে বাণিজ্যের পাশাপাশি সম্প্রতি তিনি জলাবায়ু বিষয়েও দায়িত্ব পেয়েছেন। ফাঁকা

একটি চায়নিজ রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে খেতে তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করছিলেন, কেন জলবায়ু পরিবর্তনকে তিনি তাঁর দেশের জনগণের জন্য একই সাথে মারাত্মক হুমকি ও সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

হুমকি, কেননা বলিভিয়া খাবার পানি ও সেচের জন্য হিমবাহের ওপর নির্ভর করে এবং রাজধানীর পার্শ্ববর্তী সুউচ্চ পর্বতমালা দিনে দিনে ধূসর ও বাদামি হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ, কেননা বলিভিয়ার মতো দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ বাড়ানোর জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয় বলে নিজেদেরকে 'ক্লাইমেট ক্রেডিটর' বা 'জলবায়ু পাওনাদার' হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ ও প্রযুক্তি এই দেশগুলোর প্রাপ্য, যা দিয়ে তারা জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলানো ও ভবিষ্যতের জন্য 'সবুজ জ্বালানি'র পথ তৈরি করতে পারে।

তিনি সম্প্রতি এ বিষয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে দেওয়া এক ভাষণে এই সম্পদ স্থানান্তরের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন, *"ছোট ছোট দ্বীপ, স্বল্পোন্নত ও ভূ-আবদ্ধ দেশ এবং ব্রাজিল, ভারত, চীনসহ বিভিন্ন দেশের বিপদাপন্ন হয়ে পড়া কোটি কোটি মানুষ এমন এক সমস্যার ভুক্তভোগী, যে সমস্যার জন্য তারা দায়ী নয়...যদি আগামী দশকের মধ্যে আমাদের কার্বন উদ্‌গিরণ কমিয়ে আনতে হয় তাহলে এর জন্য যে ধরনের মহাযজ্ঞ হাতে নিতে হবে তা ইতিহাসে বিরল। গোটা পৃথিবীর জন্য এক 'মার্শাল প্ল্যান' হাতে নিতে হবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে যে মাত্রায় অর্থ ও প্রযুক্তি স্থানান্তর করতে হবে তার কোনো নজির ইতিহাসে নেই...।"*

সন্দেহ নেই, সারা পৃথিবীর জন্য মার্শাল প্ল্যানের খরচ হবে বিপুল–শত শত বিলয়ন ডলার। ২০০৯ সালের আর্থিক সংকটের সেই সময়ে অনেকের কাছেই মনে হতে পারে এই বিপুল খরচই হয়তো এই পরিকল্পনা শুরুর প্রধান বাধা। অথচ ব্যাংকারদের দায় সর্বজনের ঘাড়ে চাপানোর অস্টারিটি বা ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সর্বজন খাতে চাকরি ছাঁটাই, বিদ্যালয় বন্ধ করাসহ বিভিন্ন তৎপরতা তখনো চলছে। ফলে আর্থিক সংকট নাভারো লানোসের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নযোগ্য বলেই প্রমাণ করে।

আমরা সকলেই দেখলাম, ক্ষমতাবান এলিটরা যখন কোনো পরিস্থিতিকে 'সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করে, তখন তা সামাল দেওয়ার জন্য কত হাজার হাজার কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়। আমাদের বলা হলো, যদি ব্যাংকগুলোর পতন হয়, তাহলে গোটা অর্থনীতি ধসে যাবে। যেহেতু এটা সকলের যৌথভাবে বাঁচার সংকট, তাই যেকোনো মূল্যে অর্থের ব্যবস্থা করতেই হবে। তারও কয়েক বছর আগে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের সন্ত্রাসবাদী হামলার পরও এমন করে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এরকম বহু পশ্চিমা দেশেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার আর দেশের বাইরে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় অর্থের সংকট কোনোদিনই ঘটেনি।

জলবায়ু পরিবর্তনকে আমাদের নেতৃবৃন্দ কখনোই এমনভাবে 'সংকট' হিসেবে দেখেননি, যদিও জলবায়ু পরির্বতন বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনের ওপর যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে, তার তুলনায় ব্যাংক বা ভবনধসের প্রভাব কিছুই নয়। এই মহাবিপর্যয় এড়ানোর জন্য আমাদের বিজ্ঞানীরা কার্বন উদ্‌গিরণ হ্রাসের জন্য যে তাগাদা দিচ্ছেন তাকে এমন হালকাভাবে দেখা হচ্ছে, যেন এগুলো মামুলি পরামর্শ ছাড়া কিছুই নয়; যেন এগুলোকে চাইলেই অগ্রাহ্য করা যায়। ফলে এটা পরিষ্কার যে, কোনো ঘটনাকে সংকট হিসেবে দেখা হবে কি হবে না, এটা শুধু ঘটনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে না; এর সাথে ক্ষমতার প্রশ্নও জড়িত। কিন্তু আমাদের তো বসে থাকলে চলবে না। কোনো ঘটনাকে সংকট হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা শুধু রাজনীতিবিদদেরই থাকে না, গণ-আন্দোলনও এই কাজটি করতে পারে।

ব্রিটিশ ও মার্কিন ক্ষমতাবানদের জন্য দাসত্ব কোনো সংকট ছিল না, দাস ব্যবস্থা বিলোপের আন্দোলন তাদের বাধ্য করেছিল। বর্ণবাদও কোনো সমস্যা ছিল না যতদিন না সিভিল রাইটস মুভমেন্ট বা নাগরিক অধিকার আন্দোলন তাকে সংকট হিসেবে হাজির করে। নারীর প্রতি বৈষম্য ক্ষমতাবানদের জন্য কোনো সংকট ছিল না, নারীবাদীদের আন্দোলন সেটাকে সংকট হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করে।

একইভাবে, আমরা যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ মানুষ যদি জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বন্ধ করি এবং সিদ্ধান্ত নিই, জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটা সংকট, যা মোকাবিলা করার জন্য একটি মার্শাল প্ল্যান প্রয়োজন, তাহলে ক্ষমতাবান শ্রেণি সাড়া দিতে বাধ্য হবে। তারা বাধ্য হবে এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ দিতে এবং বাজারের নিয়মকানুনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে, যা তারা নিজেদের স্বার্থে প্রায়ই করে থাকে। ইতোমধ্যেই এ ধরনের নজির আমরা দেখেছি। ফেব্রুয়ারি ২০১৪-তে ব্রিটেনের একটা বড় অংশে যখন বন্যা দেখা দেয় এবং সরকারের দায়িত্বহীনতায় জনগণ খেপে ওঠে, ব্যয় সংকোচনের অগ্রপথিক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলতে বাধ্য হন, "এই কাজে অর্থ কোনো সমস্যা নয়। যত অর্থ লাগবে আমরা ব্যয় করব।"

> ক্ষমতাবান এলিটরা যখন কোনো পরিস্থিতিকে 'সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করে, তখন তা সামাল দেওয়ার জন্য কত হাজার হাজার কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়।

বলিভিয়া নিয়ে নাভারো লানোসের কথা শুনতে শুনতে আমি উপলব্ধি করতে শুরু করি, জলবায়ু পরিবর্তনকে যদি সত্যিকার অর্থেই এক পৃথিবীব্যাপী জরুরি অবস্থা হিসেবে দেখা হয়, তাহলে কেমন করে তা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে লাগতে পারে, যার মাধ্যমে শুধু বৈরী আবহাওয়ার হাত থেকেই আমরা রক্ষা পাব তা নয়, অন্য আরো বহু বিবেচনায়ই নিরাপদতর ও বৈষম্যমুক্ত একটা সমাজ আমরা তৈরি করতে পারব। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসা এবং আসন্ন চরম আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করার প্রয়োজন পড়বে, তার মাধ্যমে একই সাথে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা এবং নিরাপদ পানি থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সংযোগের মতো অতি প্রয়োজনীয় সেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এটা এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া বা টিকে থাকার (জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক ভাষায় যাকে অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন ও মিটিগেশন বা প্রশমন বলা হয়) চেয়ে আরো বড় কিছু।

এই কথোপকথনের পর থেকে আমি আর জলবায়ু বিপর্যয়ের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় ঝাঁপ দিতে ভয় পাইনি। আমি এ বিষয়ে বিভিন্ন আর্টিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো এড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করলাম, হাতের কাছে যা পেলাম পড়ে ফেললাম। সমস্যাটিকে পরিবেশবাদীদের কাছে ইজারা দেওয়াও বন্ধ করে দিলাম। এটা অন্যদের ইস্যু, অন্যদের কাজ বলে নিজেকে বুঝ দেওয়াও বন্ধ করলাম। সেই সাথে জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলনের সাথে যুক্ত

বিভিন্নজনের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমার কাছে পরিষ্কার হতে থাকল কত রকম উপায়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে কাজে লাগানো যায়–স্থানীয় অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠনের পেছনে প্রগতিশীলদের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে, করপোরেট আধিপত্যের হাত থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করার কাজে, ক্ষতিকর নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রতিরোধ ও পুরনো চুক্তি নতুন করে লেখার কাজে, অর্থসংকটে ভোগা গণপরিবহন ব্যবস্থা ও সবার জন্য বাসস্থান তৈরির কাজে অর্থ বিনিয়োগে, জল ও জ্বালানির মতো জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতের পুনর্দখল, অসুস্থ কৃষি ব্যবস্থাকে সুস্থ করে তোলা, জলবায়ু অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করা, আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের কাজে ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে এক দেশ থেকে আরেক দেশের সাথে এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান তীব্র বৈষম্য নিরসন করা যায়।

আমার চোখে নতুন ধরনের জোট ও যুক্তির উপস্থিতি ধরা পড়তে লাগল। এগুলো ইঙ্গিত দেয় কেমন করে এইসব সমস্যাকে আরো বৃহত্তর পরিসরে বুঝতে শিখলে জলবায়ু সংকট নিরসনের তাগিদ কাজে লাগিয়ে মানবতাকে এক বর্বর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষার জন্য আপাত বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ইস্যুকে একসূত্রে গাঁথার মতো শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সংগঠিত হতে পারে।

পিপলস শক বা জনগণের আঘাত

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন একেবারে ভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটাতে পারে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সন্ত্রাসী আক্রমণ ও যুদ্ধের মতো মারাত্মক অভিঘাত বা 'শক'-এর মধ্যে পড়লে বিভিন্ন দেশে ও সমাজে কী ঘটে এ বিষয়ে আমি ১৫ বছর ধরে গবেষণা করছি। আমি আমার আগের বই 'দ্যা শক ডকট্রিন'-এ আলোচনা করেছি চার দশক ধরে করপোরেট শক্তি এরকম নানা ধরনের সংকটকে পদ্ধতিগতভাবে কাজে লাগিয়ে কতিপয় ধনী ক্ষমতাবানের সুবিধা করে দিয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান আইনকানুন শিথিলকরণ, সামাজিক ব্যয় হ্রাস এবং সর্বজনের সম্পদ বেসরকারীকরণ হয়েছে। বিভিন্ন নাগরিক অধিকার খর্ব করা ও মানবাধিকারের ভয়ংকর লঙ্ঘনের কাজেও এই ধরনের সংকটকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে সামাজিক বনভূমিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন গাছের বাগানে পরিণত করা হচ্ছে, যেন বাগান মালিকরা তথাকথিত 'কার্বন ক্রেডিট' দাবি করতে পারে, শেয়ার মার্কেটে 'ওয়েদার ফিউচার'-এর ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে, বিভিন্ন ব্যাংক ও কোম্পানি আবহাওয়ার পরিবর্তনকে ঘিরে জুয়া খেলছে

জলবায়ু সংকটের ক্ষেত্রেও যে ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে না তার অনেক নজির এখনই দেখা যাচ্ছে–সারা পৃথিবীতে সামাজিক বনভূমিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন গাছের বাগানে পরিণত করা হচ্ছে, যেন বাগান মালিকরা তথাকথিত 'কার্বন ক্রেডিট' দাবি করতে পারে, শেয়ার মার্কেটে 'ওয়েদার ফিউচার'-এর ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে, বিভিন্ন ব্যাংক ও কোম্পানি আবহাওয়ার পরিবর্তনকে ঘিরে জুয়া খেলছে, যেন ভয়াবহ বিপর্যয়গুলো লাস ভেগাসে জুয়ার টেবিলে বাজি খেলার উপাদান (২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল এই এক বছরে ওয়েদার ডেরিভেটিভ বাজার ৯.৭ বিলিয়ন থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে ৪৫.২ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়)। বৈশ্বিক পুনর্বিমা কোম্পানিগুলো জলবায়ু বিপর্যয়ের মুখে পড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে নতুন ধরনের সুরক্ষা স্কিম বিক্রি করে বিলিয়ন ডলার মুনাফা কামাচ্ছে।

বৃহৎ অস্ত্র কোম্পানি রেথিওন বলছে, "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার চাহিদা ও আচরণের পরিবর্তন ঘটার কারণে নতুন ব্যবসা বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।" এই সুযোগের মধ্যে বেসরকারীকৃত 'দুর্যোগ সেবা'র চাহিদা ছাড়াও রয়েছে 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাড়তি খরা, বন্যা, ঝড়ের কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তা সংকট সামাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক পণ্য ও সেবার চাহিদা'।

খরা ও বন্যা অস্ত্র ছাড়াও বহু ধরনের ব্যবসার সুযোগ করে দেয়। ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অন্তত ২৬১টি জলবায়ু সহনশীল শস্যজাতের ওপর পেটেন্ট আবেদন করা হয়েছে। এর ৮০ শতাংশেরও বেশি মনসান্টো, সিনজেন্টাসহ ৬টি বৃহৎ অ্যাগ্রোজায়ান্ট কোম্পানির। অন্যদিকে মহাঝড় 'স্যান্ডি'কে কেন্দ্র করে নিউ জার্সির আবাসন ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত হালকা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কোটি কোটি ডলারে নির্মাণকাজ বাগিয়ে নিয়েছে, যদিও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পাবলিক হাউজিংয়ে বসবাসকারীরা দুঃসহ সময় পার করছে। হারিকেন ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্ত নিউ অরলিন্সবাসীর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনার কোনোটাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা যে ব্যবস্থার মধ্যে আছি, তার কাজই হলো সর্বজনের সম্পদ বেসরকারীকরণ ও বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন। অবশ্য সংকটে যে সব সময় 'শক ডকট্রিন'ই কাজ করে তা নয়, সমাজে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের ঘটনাও ঘটে। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার সময় দুনিয়াজুড়ে আমরা এর বিভিন্ন নজির দেখেছি। হঠাৎ খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরব বসন্তের শর্ত তৈরির ভূমিকা পালন করেছে। অস্টারিটি বা ব্যয় সংকোচন নীতিমালার প্রভাবে গ্রিস থেকে স্পেন, চিলি, যুক্তরাষ্ট্র, কুইবেকে গণ-আন্দোলন তৈরি হয়েছে। যদিও এই আন্দোলনগুলো দেখিয়েছে, শুধু না বলাটাই যথেষ্ট নয়। শুধু জ্বলে ওঠা আর নিভে যাওয়ার চেয়েও বেশি কিছু যদি করতে হয় তাহলে বর্তমান ব্যবস্থাটার বদলে কোন্ ব্যবস্থা আমরা চাই এবং কোন্ কৌশলে আমরা তা অর্জন করব, এই বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

বড় ধরনের সংকটের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের বিজয় অর্জনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে ১৯২৯-এর বাজারধসের পর 'নিউ ডিল' চুক্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলোর কথা বলা যেতে পারে। এইসব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য 'শক ডকট্রিন'-এ বর্ণিত কোনো কর্তৃত্বপরায়ণ কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হয়নি, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অর্জন করা গেছে। সে সময় অর্জন করা জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষয়িষ্ণু হলেও এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে, যেমন–সর্বজনের স্বাস্থ্য বিমা, বয়স্কদের পেনশন, আবাসনে ভর্তুকি, শিল্পকলার জন্য সরকারি বরাদ্দ ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি, জলবায়ু পরিবর্তন এর চেয়ে বড় আকারে পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সুযোগ সামনে এনেছে। কার্বন উদ্‌গিরণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনার পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই আমরা এমন সব নীতিমালার দাবি সামনে আনতে পারি, যেগুলোর মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস, বিপুল পরিমাণ ভালো কর্মসংস্থান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের

অংশগ্রহণকে আরো শক্তিশালী করতে পারি। সম্পদ লুণ্ঠন ও নিপীড়নের 'শক ডকট্রিন'-এর বদলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে উঠবে 'পিপলস শক' বা জনগণের অভিঘাত– নিচ থেকে ওপরের দিকে আঘাত।

বিশ্বের সরকারগুলো দুই দশকের বেশি সময় ধরে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের কথা বলছে। বাস্তবতা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনকে বিপজ্জনক সীমার নিচে বেঁধে রাখার দায়িত্ব যে আন্তসরকারি সংগঠনের ওপর ন্যস্ত ছিল, তারা ৯০টিরও বেশি আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও ২০ বছরেরও বেশি চেষ্টায় সে কাজটি করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৩ সালে কার্বন নিঃসরণ ১৯৯০ সালের তুলনায় প্রায় ৬১ শতাংশ বেড়েছে। এমআইটির অর্থনীতিবিদ জন রেইলির ভাষায়: *"নিঃসরণ নিয়ে আমরা যত কথা বলছি, নিঃসরণ ততই বাড়ছে।"* আসলে কার্বনের চেয়ে দ্রুত হারে একমাত্র যে জিনিসটির নিঃসরণ বাড়ছে তা হলো কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতিমূলক শব্দমালা। এদিকে জলবায়ু সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের আশা-ভরসার স্থল জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন দিনে দিনে পরিবেশদূষণ কমানোর জন্য একটি সিরিয়াস দর-কষাকষির ফোরামের বদলে ব্যয়বহুল 'কার্বন গ্রুপ থেরাপি সেশনে' পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর উঁচু পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এখানে এসে তাঁদের দুঃখ ও রাগ প্রকাশ করেন আর দায়ী দেশগুলোর নিচু পর্যায়ের প্রতিনিধিরা নিজের জুতার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

২০০৯ সালে সাড়া জাগানো কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনের ব্যর্থতার পর থেকে এরকম একটা অবস্থাই বিরাজ করছে। সেই মহাসম্মেলনের শেষ রাতে একদল জলবায়ু আন্দোলনকারীর সাথে আমার কথা হয়, যাঁদের মধ্যে ব্রিটেনের একেবারে সামনের সারির একজন আন্দোলনকারীও ছিলেন। তিনি গোটা সম্মেলন চলাকালে বেশ আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছেন, সাংবাদিকদের কাছে প্রতিদিনের দর-কষাকষির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, দূষণের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব জগতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যা করেছেন। সম্মেলনের ফলাফল বিষয়ে তাঁকে কখনোই কম আশাবাদী মনে হয়নি। কিন্তু যখন সম্মেলনটা সমাপ্ত হলো এবং একটা দুর্ভাগ্যজনক চুক্তি সম্পন্ন হলো, আমাদের চোখের সামনে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। এক আলোকোজ্জ্বল ইতালীয় রেস্তোরাঁয় বসে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বার বার বলছিলেন, *"আমি আসলেই মনে করেছিলাম ওবামা বুঝবেন।"*

আমার কাছে মনে হয়, সেই রাতটি ছিল জলবায়ু আন্দোলনের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময়, কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না– এরকম একটা উপলব্ধি তৈরি হওয়ার সময়। আসলে আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই, আমাদের বাঁচার একমাত্র আশার উৎস তলায় থাকা মানুষ।

কোপনহেগেনে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো বৃহৎ দূষণকারী রাষ্ট্রগুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতাহীন এক চুক্তি করে। এই ২ ডিগ্রি কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি লক্ষ্যমাত্রা, যা মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্ধারিত; এই ২ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পেছনে সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের জীবন রক্ষার চেয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি সর্বনিম্ন রাখার বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে ২ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হওয়ার সময় উপস্থিত বহু প্রতিনিধিরা এই লক্ষ্যমাত্রাকে বহু নিচু দ্বীপ ও সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশের জন্য 'মৃত্যুদণ্ড' ঘোষণার শামিল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আসলে এই লক্ষ্যমাত্রা আমাদের সকলের জন্যই বিপজ্জনক। নব্বইয়ের তুলনায় এখন পর্যন্ত তাপমাত্রা কেবল ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, তাতেই আমরা ২০১২ সালের গ্রীষ্মে গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলে যাওয়া কিংবা সাগরের অম্লত্ব বৃদ্ধির মতো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে শুরু করেছি। তাপমাত্রা এর দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেলে নিশ্চিতভাবেই আরো ভয়ংকর বিপর্যয় তৈরি করবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, দূষণকারী দেশগুলো কোনো আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি করছে না। ফলে তারা খুব সহজেই তাদের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করতে পারছে। বস্তুত দূষণ এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটলে দূষণ ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখার আশা ইউটোপিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু পরিবেশবাদীরাই যে একথা বলছে তা নয়। বিশ্বব্যাংকও এক সতর্কবার্তায় বলেছে, *"আমরা [শতাব্দী শেষে] ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির পথে আছি। তার ফলাফল হবে তীব্র দাবদাহ, বৈশ্বিক খাদ্য সংকট, প্রাণবৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ও সমুদ্রের পানির উচ্চতার মারাত্মক বৃদ্ধি।"* রিপোর্টে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়,

যে কারণে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অন্তসারশূণ্য

প্রথমত, প্যারিস চুক্তিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের 'বেশ নিচে', এমনকি ১.৫ ডিগ্রি রাখার কথা বলা হলেও (আর্টিক্যাল ২) এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কোন দেশকে কী মাত্রায় গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গিরণ কমাতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বাস্তবায়নের জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বলা হয়েছে, প্রতিটি দেশ নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং পাঁচ বছর পর পর তা পুনর্নির্ধারণ করবে (আর্টিক্যাল ৪)। যদি কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে এরকম অন্তত ৫৫টি দেশ ২২ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ২১ এপ্রিল ২০১৭-এর মধ্যে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে তাহলে গ্রিনহাউস নিঃসরণ কমানোর 'লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা' প্রতিটি দেশের জন্য বাধ্যবাধকতামূলক হবে কিন্তু কে কত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট দেশের ঐচ্ছিক ব্যাপার (আর্টিক্যাল ২০১,২১)।

কী ঘটবে যদি ওই লক্ষ্যমাত্রা তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখার জন্য যথেষ্ট না হয়? কিংবা যদি কোনো দেশ তার ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিঃসরণ না কমায়? এই চুক্তিতে এ বিষয়ে বাধ্য করার মতো কিছুই নেই! ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য যে মেকানিজমের কথা বলা হয়েছে তা হবে 'অ-বৈরী' ও 'অ-শাস্তিমূলক' (আর্টিক্যাল ১৫)। শুধু তা-ই নয়, চুক্তি কার্যকর হওয়ার তিন বছর পর থেকে যে কোনো দেশ চুক্তি থেকে অব্যাহতি নিতে পারবে এবং তার জন্য দেশটিকে কোনো খেসারতও দিতে হবে না (আর্টিক্যাল ২৮)!

দ্বিতীয়ত, চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দেশের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা প্রতিরোধের গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও (আর্টিক্যাল ৮) ক্ষতিপূরণের দায় নিতে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। জলবায়ু সম্মেলনের অ্যাডাপ্টেশন ডকুমেন্টের আর্টিক্যাল ৫২-তে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or compensation."

-সর্বজনকথা ডেস্ক

"এখনকার তুলনায় আরো ৪ ডিগ্রি উষ্ণতর পৃথিবীর সাথে অভিযোজন আদৌ সম্ভব হবে কি না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

আমরা জানি না ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতর পৃথিবী আসলে কেমন হবে। হয়তো ২১০০ সাল নাগাদ সাগরের পানির উচ্চতা ১ মিটার, এমনকি ২ মিটারও বাড়িয়ে দিতে পারে। যার ফলে হয়তো মালদ্বীপ কিংবা টুভালুর মতো দ্বীপরাষ্ট্র পুরোপুরি ডুবে যাবে; ইকুয়েডর, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটা বিশাল অংশ ডুবে যাবে। অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষের জীবন হরণকারী নিষ্ঠুর দাপদাহ হয়তো একমাত্র অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া আর সব মহাদেশের জন্য গ্রীষ্মকালীন স্বাভাবিক বাস্তবতায় পরিণত হবে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বজুড়েই হয়তো খাদ্যশস্যের ফলন কমবে। এর সাথে যদি ঘূর্ণিঝড়, দাবানল, পানি সংকট, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, মহামারি ইত্যাদি যুক্ত হয়, তাহলে একটা শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত সমাজের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করাই কঠিন।

ফলে জলবায়ু বিপর্যয় মানবজাতির জন্য অস্তিত্বের সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইতিহাসে এই মাত্রায় সংকট আর মাত্র একবারই এসেছিল– শীতল যুদ্ধের সময় পারমাণবিক মহাবিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, যার ফলে পৃথিবীর একটা বিশাল অংশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা তো ছিল (এখনো আছে) কেবল একটা হুমকি মাত্র– যদি ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলেই কেবল এরকম বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা থাকে। বেশির ভাগ নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী কিন্তু আমাদের বলেননি যে, আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি সেভাবেই যদি জীবন যাপন করতে থাকি তাহলে আমাদের গোটা সভ্যতাই ধ্বংসের মুখে পড়বে। অথচ জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বহু বছর ধরে ঠিক এই কথাটাই আমাদের বলছেন।

বিভিন্ন দেশের সরকার জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে কেমন করে কর ও জরিমানার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে, যখন এ ধরনের যেকোনো পদক্ষেপকেই 'কঠোর নিয়ন্ত্রণকারী কমিউনিজম' হিসেবে নিন্দা করা হয়? আর নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকেই বা কেমন করে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব, যখন বাজার সুরক্ষামূলক যেকোনো শব্দকেই ঘৃণার চোখে দেখা হয়?

ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির জলবায়ু বিশেষজ্ঞ লোনি জি. থম্পসন হিমবাহ গলন বিষয়ক বিশ্বনন্দিত বিশেষজ্ঞ। তিনি ২০১০ সালে বলেছেন, *"অন্যান্য বিজ্ঞানীর মতোই জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা ভাবলেশহীন ধরনের মানুষ। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে জাতীয় অতিনাটকীয় কথা আমরা বলি না। আমাদের বেশির ভাগই সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেওয়া কিংবা কংগ্রেসীয় কমিটির কাছে শুনানির চেয়ে পরীক্ষাগারে কিংবা মাঠে তথ্য সংগ্রহ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাহলে জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা কেন এমন করে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ সম্পর্কে কথা বলছেন? এর উত্তর হলো, আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ যে জলবায়ু পরিবর্তন সভ্যতার জন্য সুস্পষ্ট ও মূর্ত এক বিপদ।"*

এর চেয়ে পরিষ্কার করে আর কী বলা যেতে পারে! অথচ সতর্ক হওয়া এবং বর্তমান পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য যার যতটুকু ক্ষমতা আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে মানবজাতির একটা বিশাল অংশ সচেতনভাবে আগের পথেই চলছে।

আমাদের সমস্যাটা কী?

সময়টাই খারাপ

আমার মনে হয়, উত্তরটা খুব সহজ– দূষণ হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো আমরা করিনি, কারণ এই কাজগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের (ডিরেগুলেটেড ক্যাপিটালিজম) মৌলিক বিরোধ রয়েছে। যে সময়ে আমরা সংকট থেকে বের হওয়ার সংগ্রাম করছি, সেই সময়জুড়ে ছিল এই মতাদর্শেরই রাজত্ব। আমরা আটকে গেছি, কারণ যে কাজগুলোর মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো যেত এবং দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষের জন্যই কল্যাণকর হতো, সেই কাজগুলো সংখ্যালঘিষ্ঠ কতিপয় ক্ষমতাবানের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের হাতেই আছে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ। ইতিহাসের অন্য কোনো পর্যায়ে হাজির হলে হয়তো এই সংকট সমাধান এত দুরূহ হতো না। কিন্তু আমাদের সকলের মহা দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞানী মহল যে সময়টাতে এসে জলবায়ু সংকটের কথা ঘোষণা করলেন, ঠিক সেই সময়টাতে এই ক্ষমতাবানরা ১৯২০-এর দশকের পর সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ভোগ করছে।

গত ২৫ বছরের আন্তর্জাতিক দর-কষাকষির দিকে ফিরে তাকালে একেবারে দুটি ভিন্ন ঘটনা চোখে পড়বে। একদিকে রয়েছে জলবায়ু সংকটকে কেন্দ্র করে দর-কষাকষি : লড়াই চলছে, লক্ষ্য অর্জন করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে করপোরেট বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া : একটার পর একটা জয় লাভ করছে–প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে শুরু করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গঠন, সোভিয়েত অর্থনীতির বেসরকারীকরণ, এশিয়ার একটা বৃহত্তর অংশকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে রূপান্তর, আফ্রিকার কাঠামোগত পরিবর্তন ইত্যাদি। জনগণের প্রতিরোধের মুখে মাঝে মাঝে এগুলো থমকে গেছে, পিছিয়েছে কিন্তু মতাদর্শগত ক্ষেত্রে গোটা প্রকল্পটাই একরকম সফলতা পেয়েছে। স্রেফ এক দেশের পণ্য আরেক দেশে–ফ্রেঞ্চ ওয়াইন ব্রাজিলে কিংবা মার্কিন সফটওয়্যার চীনে–বিক্রি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল না, মূল উদ্দেশ্য ছিল বহুজাতিক করপোরেশনের জন্য এমন একটা নীতি-কাঠামো বাস্তবায়ন করা, যেন তারা সবচেয়ে সস্তায় পণ্য তৈরি করে সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ও সবচেয়ে কম কর দিয়ে সেই পণ্যগুলো বিক্রি করতে পারে।

এই যুগের তিনটি মূল নীতি-স্তম্ভের সাথে আমরা সবাই পরিচিত: সর্বজন খাতের বেসরকারীকরণ, করপোরেট খাতগুলোকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিদান এবং করপোরেট কর হ্রাস, ফলে সর্বজন খাতেও ব্যয় হ্রাস। বাজারি দর্শন জনজীবনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে জলবায়ু সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত, সেগুলো রীতিমতো পাপ বলে বিবেচিত। পাবলিক সেক্টর বা সর্বজন খাতকে যখন পাইকারিভাবে বেচে দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, তখন কেমন করে কার্বনশূন্য সর্বজন পরিষেবা খাতে বিপুল হারে বিনিয়োগ হবে? বিভিন্ন দেশের সরকার জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে কেমন করে কর ও জরিমানার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে, যখন এ ধরনের যেকোনো পদক্ষেপকেই 'কঠোর নিয়ন্ত্রণকারী কমিউনিজম' হিসেবে নিন্দা করা হয়? আর নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকেই বা কেমন করে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব, যখন বাজার সুরক্ষামূলক যেকোনো শব্দকেই ঘৃণার চোখে দেখা হয়?

এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো– বহু দূরদূরান্তে ভোগ্যপণ্য রপ্তানি (পথে বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো) এবং সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও খাদ্যসামগ্রী আমদানি (এক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো)। অন্য কথায়, বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি অবমুক্তকরণের মাধ্যমে যে বাজার অবমুক্তকরণ হলো, তা-ই আবার আর্কটিকের বরফ অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে নাটকীয়ভাবে এগিয়ে নিচ্ছে। আর গবেষণা প্রতিষ্ঠান টিনডাল সেন্টারের কেভিন অ্যান্ডারসনের মতো বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো, এত বিপুল পরিমাণ কার্বন এর মধ্যেই বায়ুমণ্ডলে অবমুক্ত করা হয়েছে যে উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার মধ্যে রাখার একমাত্র উপায় হলো ধনী দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ প্রতিবছর ৮ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস। 'মুক্ত' বাজারকে দিয়ে এই কাজ কোনোদিনই সম্ভব নয়। বস্তুত বাজার অর্থনীতিতে এই হারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পেয়েছে স্রেফ অর্থনৈতিক ধস বা মহামন্দার সময়। মূলকথা হলো, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ধরিত্রী-ব্যবস্থার (প্ল্যানেটারি সিস্টেম) যুদ্ধ বেধে গেছে। আরো স্পষ্ট করে বললে, আমাদের অর্থনীতির সাথে মানবপ্রাণসহ পৃথিবীর বহু ধরনের প্রাণের যুদ্ধ বেধেছে। জলবায়ু বিপর্যয় এড়ানোর জন্য প্রয়োজন সম্পদের ব্যবহার হ্রাস বা সংকোচন, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ধস এড়ানোর জন্য প্রয়োজন সম্পদ ব্যবহারের সম্প্রসারণ– এর যেকোনো একটা নিয়মই কেবল পাল্টানো যেতে পারে এবং নিশ্চিতভাবেই প্রকৃতির নিয়মটা পাল্টানো যাবে না। সুতরাং আমরা এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি– হয় জলবায়ু বিপর্যয় আমাদের চারপাশের সবকিছু পাল্টে দেবে অথবা এই বিপর্যয় এড়ানোর জন্য আমরা আমাদের অর্থনীতির সবকিছু পাল্টে দেব।

শুধু শক্তি নয়, প্রশ্নটা ক্ষমতার

সম্প্রতি 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার এক জ্যেষ্ঠ সম্পাদক গ্যারি স্টিকসের একটি লেখা চোখে পড়ল। আর্টিক্যালটা অনেকটা নিজের দোষ স্বীকার করে লেখার মতো। ২০০৬ সালে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। ওই সময়কার আর দশটা প্রচেষ্টার মতোই তাঁরও মনোযোগ ছিল কার্বন হ্রাসের প্রযুক্তিকে ঘিরে। কিন্তু ২০১২ সালে এসে তাঁর উপলব্ধি, তিনি আরো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনকে এতদিন এড়িয়ে গেছেন– এমন একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ, যার ওপর দাঁড়িয়ে এই নতুন নতুন প্রযুক্তি বিদ্যমান লাভজনক দূষণকারী প্রযুক্তিগুলোকে টেক্কা দিতে পারবে। তিনি লিখেছেন, "*জলবায়ু পরিবর্তনকে যদি সত্যিকার অর্থে মোকাবিলা করতে চাই তাহলে সামাজিক ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকেই মনোযোগ দিতে হবে। সেই তুলনায় পরবর্তী প্রজন্মের সোলার সেলের ইফিশিয়েন্সির গুরুত্ব সামান্যই।*"

রূপান্তরের কারিগরি দিক অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সবুজ জ্বালানি, ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে গণপরিবহন ইত্যাদির চেয়ে আমার চিন্তা মূলত রূপান্তরের ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও মতাদর্শগত বাধাগুলো নিয়ে। এই বাধাগুলোর কারণেই বহুদিন ধরেই জানা থাকা কারিগরি সমাধানগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। আমি মনে করি, আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান সৌরশক্তির ওপর যতটা না নির্ভর করে, তার চেয়ে ঢের বেশি নির্ভর করে মানব-ক্ষমতার রাজনীতির ওপর; বিশেষত এই ক্ষমতার প্রয়োগ কে কার স্বার্থে করবে তার পরিবর্তনের ওপর, ক্ষমতা করপোরেশনের হাত থেকে সমাজের হাতে যাবে কি না তার ওপর। এই বিষয়টি আবার নির্ভর করবে বর্তমান ব্যবস্থায় নানাভাবে বঞ্চিত সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যথেষ্ট দৃঢ় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক ক্ষমতা নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি না তার ওপর।

সবকিছুর তলায় চাপা পড়ে আছে সেই সত্য, যা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি: জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্য কিংবা কর ব্যবস্থার ন্যায় আর দশটা 'ইস্যু'র একটা নয়, এটা গোটা সভ্যতার জেগে ওঠার আহ্বান, বন্যা-খরা-আগুন-ধ্বংসের ভাষায় উচ্চারিত একটা শক্তিশালী বার্তা, যা এক নতুন অর্থনৈতিক মডেল গড়া ও নতুনভাবে পৃথিবীকে ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছে।

অস্বীকৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

কিন্তু একটা মুমূর্ষু পৃথিবীতে বসবাস করার ভয় নিয়ে আমরা কী করতে পারি? প্রথমত, বাস্তবতাটা গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে এই ভয় সহসা চলে যাবে না। মৃত্যুপথযাত্রী এক পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে এটাই সবচেয়ে যৌক্তিক করণীয়, যে মৃত্যুযাত্রার পেছনে আমরাই দায়ী।

এরপর, এই ভয়টাকে কাজে লাগাতে হবে। ভয় টিকে থাকার জন্যই প্রয়োজনীয় একটা অনুভূতি। ভয় পেলে আমরা দৌড়াই, লাফ দিই, ভয়ে আমরা অনেক সময় অতিমানবিক সব কাজ করে ফেলি। কিন্তু দৌড় দিয়ে আমাদের তো কোথাও না কোথাও যেতে হবে। নইলে ভয় কেবলই অবশ করে ফেলে। সুতরাং আসল কৌশল, একমাত্র আশা হলো, কখনো স্পর্ধা হয়নি এমন ভালো কিছু গড়ার আশার মাধ্যমে অবসবাসযোগ্য পৃথিবীর ত্রাসটাকে মোকাবিলা করা। হ্যাঁ, বহু কিছুই হয়তো আমাদের হারাতে হবে, অনেক বিলাসব্যসন ত্যাগ করতে হবে, বেশ কিছু শিল্পের গোটাটাই হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনকে পুরোপুরি হয়তো ঠেকানো যাবে না, ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমরা যা-ই করি না কেন, অনেকগুলো মারাত্মক বিপর্যয়ের সামনে আমাদের পড়তেই হবে। কিন্তু আরও বড় বিপর্যয় ঠেকানোর সুযোগ এখনো রয়েছে, নিজেদের পাল্টানোর মাধ্যমে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটা এড়ানোর জন্য এখনো সময় আছে। আর এই লক্ষ্যটা আমার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই সংকটটি এত বড় এবং এত সর্বব্যাপী যে সবকিছুই পাল্টে যাবে, কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না। আমাদের কাজকর্ম, আমাদের আশা, নিজেদের কাছে এবং নেতাদের কাছে আমাদের দাবিদাওয়া– সবকিছুই পরিবর্তন করে দেবে এই সংকট। এর অর্থ হলো, এতদিন ধরে যেসব বিষয়কে অনিবার্য বলা হয়েছে, তার অনেক কিছুই আর ঘটবে না এবং যা কিছুকে এতদিন অসম্ভব বলে চালানো হয়েছে, তার অনেক কিছুই ঘটতে থাকবে।

আমরা কি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারব? আমি শুধু জানি, জলবায়ু পরিবর্তন সবকিছুকে পাল্টে দেবে– এটাই অনিবার্য, আর কোনো কিছুই নয়। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও এই পরিবর্তনের ধরনটা এখনো আমাদের ওপরই নির্ভর করছে।

[লেখাটি Naomi Klein এর This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, ২০১৫, Pengin Books এর Introduction অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছে। সর্বজনকথার জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন **কল্লোল মোস্তফা**]